সঙ্ঘশরণ তীর্থযাত্রা

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

সাল ১৮৫৪, এপ্রিল মাস। দূর পল্লিগ্রাম জয়রামবাটীতে বিরাট উৎসবের আয়োজন। ৮ এপ্রিল বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ মহাসমারোহে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মর্মর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনদিনে প্রায় চার লক্ষ জনসমাগম হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তদের জন্য আঠাশটি খড়ের লম্বা দোচালা ও কয়েকশো তাঁবুর ব্যবস্থা। পাঁচটি ডায়নামোয় জ্বালানো হয়েছে শত শত বৈদ্যুতিক আলোর মালা। জয়রামবাটী গ্রামকে চেনা যাচ্ছে না। সেই উৎসবের বিপুল সমারোহের মধ্যেই সকলের অলক্ষে ঘটে গিয়েছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম স্বতন্ত্র সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘের অধ্যক্ষার নির্বাচন। কোনও প্রচার নেই, আড়ম্বর নেই, নিঃশব্দে এক মহাবিপ্লবের নায়িকা নির্বাচিত হলেন পুণ্যক্ষেত্র জয়রামবাটীতে।

উৎসবে যোগ দিতে কাশী থেকে এসেছেন একটি মহিলাদের দল। সেখানে আছেন শ্রীশ্রীমার শিষ্যা ও সেবিকা শ্রীসরলা দেবী। খুব কাছ থেকে প্রতিনিয়ত মাকে দেখা, তাঁর সেবা করা, তাঁর অদর্শনের পরে দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে একান্ত সাধনা, তপস্যা এই তপস্বিনীকে সকলের মধ্যে আলাদা করে চিনিয়ে দিত। সহজেই তাঁর দিকে চোখ যেত। ১৯৪৫ সালে কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে মন্দিরমুখী একদল ভক্তমহিলার মধ্যে তাঁকে প্রথম দেখে এক তরুণীর মনে হয়েছিল, এত শান্ত সুন্দর মূর্তি সাধারণত চোখে পড়ে না। তাঁর শান্ত মাধুর্য সর্বাঙ্গে যেন ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

সেদিন জয়রামবাটীর উৎসবে মহিলাদের দল তরকারি কাটছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সরলা দেবী। পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের সেবক এসে তাঁকে খবর দিলেন, ''মহারাজ ডাকছেন।'' সরলা দেবী উপস্থিত হলে মহারাজ তাঁকে বললেন, ''মেয়েদের মঠ হলে তোমায় যেতে হবে।'' সবিনয়ে আপত্তি জানালেন সরলা, এ-কাজ তিনি পারবেন না। একালের উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের নিয়ে যে-সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ গড়ে উঠতে চলেছে তার দায়িত্ব নেওয়া তো সোজা কথা নয়! মহারাজ জোর দিয়ে বললেন, ''আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তোমার দ্বারাও হবে। শ্রীমার উপর নির্ভর করে থাকবে, তাহলেই হবে। তুমি যেমন শ্রীশ্রীমার কাছে ছিলে, শ্রীমার সেই ট্রেনিংটা তুমি এই মেয়েদের দেবে।'' একান্ত নীরব তপস্যার জীবন ছেড়ে আসতে সরলা কি ব্যথিত হয়েছিলেন! নাকি তাঁর

মনে পড়ে গিয়েছিল জগদীশ্বরীর এক ভবিষ্যদ্‌বাণী! শ্রীশ্রীমার শেষ অসুখের সময় কাতর হয়ে একদিন তিনি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ''মা আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।'' উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ''তোমাকে মা আমার কিছু কাজ করতে হবে।'' এই কি সেই কাজ? তিনি আর দ্বিরুক্তি করেননি। আর সঙ্ঘগুরুর নির্দেশ তো স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশ, তাকে অমান্যই বা করেন কীভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে নিবেদিতপ্রাণ সরলা!

সারদা দেবীর সেই বিশেষ কাজটির সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ঋষি বিবেকানন্দের মানসনেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই ভেসে উঠেছিল এক অপরূপ স্বপ্ন। সেই বাল্যবিবাহের যুগে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ যা সেযুগের পটভূমিতে এককথায় ছিল অসম্ভব কল্পনা। তবু সেই দুঃসাধ্যকে সফল করতে দারুণ শীতে, আমেরিকার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে অর্থসংগ্রহ করেছেন। মিসেস বুলকে লেখা তাঁর চিঠিতে (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) ফুটে উঠেছে গভীর আর্তি : ''সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমার মৃত্যু হলে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।'' ১৮৯৭ সালে যখন রামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলী প্রস্তুত হচ্ছে, তখন একইসঙ্গে এই ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষি স্ত্রীমঠের কথা ভাবলেন। লিখলেন,

''১। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে...।

''২। যেভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে স্ত্রীলোকদিগের মঠও ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে।''

না, তাঁর জীবদ্দশায় এই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিবেকানন্দের অমোঘ শক্তি ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ কিছু নারীর চিন্তায়, চেতনায় বেজে ওঠে জাগরণের সুর। 'যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী'—এই সংকল্পে অটুট একগুচ্ছ হোমাপাখি ঈশ্বরের প্রেমের গর্বে অশঙ্ক হয়ে আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায় সম্পন্ন করা এবং আগামী যুগের গার্গী, মৈত্রেয়ীদের ত্যাগব্রতধারণকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার কথা ভেবে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, সারদা দেবীর জন্মশতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শ্রীসারদা মঠ।

কিন্তু সমস্যা অনেক। তার একটির কথা মনে করিয়ে দিয়ে পূজনীয় মাধবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন মুক্তিপ্রাণামাতাজীকে (তখন তিনি আশা বন্দ্যোপাধ্যায়), ''সব মেয়েদের নিয়ে একত্র চালাবার মতো অন্তত একজনের আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকা দরকার। শুধু intellectuals দ্বারা হয় না। মা-ঠাকরুন অথবা তাঁর কোন শিষ্যা ওই কাজ করে গেলে খুব সহজ হত। শ্রীঠাকুরের পর তাঁর সন্তানগণই মঠস্থাপন করে যাওয়ায় তাঁদের প্রবল আধ্যাত্মিকতার জোর আজ পর্যন্ত সবাইকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ভগবানের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হলে সহজ হয়।'' এই যোগাযোগটিকে সহজ করার জন্যই মঠ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন মায়ের একান্ত সেবিকা, ত্যাগব্রতধারিণী সরলা দেবীর কথা, যাঁকে বহু আগেই সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, নাম রেখেছিলেন শ্রীভারতী। শ্রীসারদা মঠের এমন উপযুক্ত কর্ণধার আর কে-ই বা আছে?

কোন বালিকা বয়স থেকে ভগবান তাঁকে এই অধ্যাত্মজগতের সম্রাজ্ঞী করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। অতি শৈশবে ভগিনী নিবেদিতার

স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়। সেই সুবাদে জগজ্জননীর পদপ্রান্তে আসেন। ঠাকুরের সন্তানদের স্নেহে ধীরে ধীরে লালিত হতে থাকেন। বৈরাগ্যের প্রেরণায় সেকালের কন্যা হয়েও তিনি সব সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে গৃহত্যাগ করেন। অবশেষে সারদা দেবীর অন্তরঙ্গ সেবিকা হয়ে তাঁর সঙ্গে নিত্যদিন বাস করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয় তাঁর। মায়ের সহচরী জয়া-বিজয়া গোলাপ মা-যোগীন মায়েরও অনেক সেবা করেছেন সরলা। তাঁরাও প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁকে। একদিন যোগীন মার কাছে খুব কেঁদেছিলেন তিনি : ''মা গেলেন, সুধীরাদি গেলেন, আর যেন ভাল লাগছে না। আমারও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'' যোগীন মা বললেন, ''সে কি কথা গো? আগে ইষ্টলাভ হোক, তবে তো যাবে। তোমার ইষ্টলাভ হোক—আমি আশীর্বাদ করি।'' শরৎ মহারাজ বলেছিলেন, ''ঠাকুর, মা তোমার ভার নিয়েই ছিলেন, কিন্তু এখন দেখলাম তাঁরা সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন। আমিও একেবারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছি।'' আশীর্বাদ করলেন, ''ভগবানলাভ করে তারপর যাবে।''

শরৎ মহারাজের শরীর যাওয়ার সঙ্গেই শেষ হল তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়। জগন্মাতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের স্নেহচ্ছায়ায় যে বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হয়েছেন তিনি, এবারে তা আত্মস্থ করার পালা। ঠিক যেমন ঠাকুরের ছেলেদের আগে ফলটি লাভ হয়ে গিয়েছিল, পরে কঠোর তপস্যায় তাঁরা যুগাবতারের কৃপায় পাওয়া সেই অমৃতত্বকে নিজের ও সবার কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন, সরলার ক্ষেত্রেও যেন সেটিই হল। তিনি চলে গেলেন কাশীতে। ওই প্রাচীন ঐতিহ্যময় পরমতীর্থে বাস করেও তিনি নির্জন সাধনায় ডুবে গেলেন। ঊষারানী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন যে সরলাদি সবসময় তাঁকে খুব জপ করতে, সাধন করতে বলতেন। কাশীতে রাত্রি দুটো থেকে আড়াইটে খুব ভাল সময়। ওই সময় রাতে নিজে জপ করতেন, ডেকে দিতেন সঙ্গিনীকে। সারাদিন জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু কাজ এবং বিশ্রাম সেরে নিয়ে সারাদিনই জপে, ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন। প্রচণ্ড গরমে কষ্ট হলে সঙ্গিনীকে গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে জপ করতে বসতে বলতেন, কিন্তু কখনও জপ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতেন না। বলতেন, ''করে দেখ না, দেখবে আনন্দ পাবে, মন শান্ত হবে, মনের ময়লা কেটে গিয়ে পরিষ্কার হবে।'' এইভাবে নিজেকে শুদ্ধ থেকে আরও শুদ্ধতর করে ঈশ্বরের অলক্ষ্য বিধানে নিজের অজান্তেই এক বিরাট কর্মভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন সন্ন্যাসিনী শ্রীভারতী।

তাঁর প্রতি বেলুড় মঠের সাধুদের ছিল অতি উচ্চ ধারণা। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, ''এই দুটি হাত মহাশক্তির সেবা করেছে। আমাকে দিয়ে দাও, আমি সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব।'' শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরে একবার পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ বলেছিলেন, ''তোমাদের মধ্যে

সরলাদেবী উপস্থিত আছেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের বহু সান্নিধ্যলাভ করেছেন। দিনে-রাতে, অসুখে-বিসুখে তাঁর বহু সেবা করেছেন। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। মা-ঠাকরুন কখন, কী রকম আচরণ করতেন, কি বলতেন—এইসব কথা উনিই তোমাদের ভাল বলতে পারবেন। ওঁর কাছ থেকেই সব শুনবে। বাইরে থেকে খরচ করে লোক ডেকে আনবার দরকার কী? আমাদের কাছে আর নতুন কী শুনবে? ইনটেলেকচুয়াল ব্যাপার হলে অন্য কোনওখানে এনকোয়ারি করতে পার। কিন্তু স্পিরিচুয়াল ব্যাপারে ওঁর কাছেই উপদেশ নেবে। উনিই তোমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন।"

এসব ঋষিবাক্য যে কত অভ্রান্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অদূর ভবিষ্যতেই, যখন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী সঙ্ঘাধ্যক্ষার পদে আসীন হলেন।

স্থির হল, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর গঙ্গার পূর্বতীরে সুরধুনী কাননে স্ত্রীমঠের উদ্বোধন হবে। কিন্তু পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দ মহারাজ চাইলেন আশ্রমবাসের যথারীতি অনুশীলন হোক আরও আগেই। ১৯৫৪ সালে মৃগাঙ্কমোহন সুর নারীকল্যাণের জন্য এন্টালি অঞ্চলে একটি বাড়ি দান করেন। মহারাজের ইচ্ছা অনুসারে ১০ জুলাই উলটোরথের দিন সরলা দেবী কয়েকজন ব্রহ্মচারিণীকে নিয়ে সেই বাড়িতে থাকতে এলেন। তাঁর দীর্ঘ সাতাশ বছরের পূজিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের ছবি প্রেসিডেন্ট মহারাজ ঠাকুরঘরে কাঠের বেদিতে স্থাপন করলেন এবং অর্ঘ্য দিলেন। এরপর ব্রহ্মচারিণীদের অন্তর্মুখ জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়ে সরলা দেবীর ওপরে তাঁদের জীবনগঠনের সব ভার অর্পণ করলেন। সরলা অনেক আগেই স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেছিলেন। ওইদিন শঙ্করানন্দ মহারাজ তাঁকে আবার গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে গৈরিক ধারণের নির্দেশ দেন। খুব অনাড়ম্বরভাবে তিনি নীরবে তাঁর নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। নিজের দিনলিপিতে ১২ জুলাই লিখলেন, ''যাতে ঠাকুর ও মায়ের ভাবের গভীরতা আসে, নিজেদের সেইভাবে উপযুক্ত হবার জন্য এখানে আমাদের নির্জনবাস। সকলে বেশ একটা ভাব নিয়ে থাকা উদ্দেশ্য।"

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি। সেদিন সরলা দেবী সহ সাতজন ব্রহ্মচারিণীর সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা হয়। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের দেওয়া সন্ন্যাসনামটিকে অপরিবর্তিত রেখেই তাঁর নামকরণ হল প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। নবযুগের বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম স্বাধীন সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘের অধ্যক্ষা। যেহেতু ততদিন পর্যন্ত শ্রীসারদা মঠ ছিল বেলুড় মঠের অধীন, সেজন্য নবীন সন্ন্যাসিনীরা কামারপুকুরে গিয়ে সহাধ্যক্ষ পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে প্রণাম করার অনুমতি চেয়ে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠির কোণে একটি মন্তব্য লিখে মহারাজ তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠালেন : ''তোমরা এখন স্বাধীন। এখন থেকে আমাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তোমাদের অধ্যক্ষাকে বলে যাবে।" এভাবে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তব আকার দিলেন। আর অত্যন্ত সুচারুভাবে সেই নবীন চারাগাছটির পালন, পোষণ এবং তাকে ক্রমে এক বিশ্বব্যাপী মহীরুহে পরিণত করার দায়িত্ব নিলেন শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী।

সঙ্ঘগুরু হিসেবে ওই বছরই মহালয়ার পর আটজন ব্রহ্মচারিণীকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষাদান করেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির দিন তিনজনকে ব্রহ্মচর্য দান করেন। সাধারণের জন্য মন্ত্রদীক্ষাদান শুরু হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর থেকে। ক্রমে তাঁর তত্ত্বাবধানে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কর্মপরিধি বিস্তৃত

হতে থাকে। শ্রীসারদা মঠের নতুন নতুন কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উৎসব, ভগিনী নিবেদিতার শতবার্ষিকী উৎসব একে একে উদ্‌যাপিত হয়। ভারতীপ্রাণা মা ছিলেন সব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। তাঁর উপস্থিতি, বক্তৃতা এবং পরামর্শ সকলের মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করত। এভাবে মাতাজীর জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল, যে-অধ্যায়ের কেন্দ্রে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সারা বিশ্বে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এই সঙ্ঘের অন্দরমহলটি গড়ে উঠেছে সন্ন্যাসীদের নিয়ে। স্বামীজী বলেছেন, ''বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই উচ্চ লক্ষ্য ভুলে যায় 'বৃথৈব তস্য জীবনম্'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।'' এই উদ্দেশ্যেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। স্বামীজী যদিও পাশ্চাত্যে সঙ্ঘজীবনের সাংগঠনিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূল ভাবটি নিয়েছিলেন তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘ থেকে, যেখানে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ এক। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘেও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সঙ্ঘকে অভিন্ন মনে করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সারদা দেবী অভেদ। তাঁদের ঐশ্বরিক অধ্যাত্মশক্তি এই সঙ্ঘে জমাট বেঁধে আছে। শিষ্যপরম্পরাক্রমে তা আরও পুঞ্জীভূত হয়েছে। যেকোনও নবাগতর প্রথম এবং প্রধান কাজ হল এই ভাবপ্রবাহে নিজেকে যুক্ত করা এবং ক্রমে সেই শক্তিতে পরিপুষ্ট হয়ে নিজের অধ্যাত্মসাধনায় সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক প্রবাহকে সঞ্জীবিত রাখা। শ্রীসারদা মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেরই একটি অঙ্গ। সুতরাং এই অধ্যাত্মশক্তিধারার উত্তরাধিকারিণী শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীরাও। তাই নিজেরা যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না হয়ে এই সঙ্ঘকে নিজকক্ষে স্থির রাখার দায়িত্ব তাঁদেরও। এই কথাটিকেই মনে রেখে শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা নবাগতা ব্রহ্মচারিণীদের অন্তর্জীবন গড়ে তোলার দিকে বিশেষ মন দিলেন।

কোনও এক ব্রহ্মচারিণী জপধ্যান কমিয়ে কাজ বাড়াচ্ছে দেখে তিনি বলেছিলেন, ''দেখো, কাজ একটু কম করলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু জপধ্যান বাদ দিলে এ-জীবনে আনন্দ পাওয়া যাবে না। দেখছ না, শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানেরা তাঁকে পেয়েও কত তপস্যা করেছেন। তবে আমাদের কিছু না করলে চলবে কেন?'' একবার কেউ তাঁকে বলেছিলেন, ''জপে মন ঠিকমতো বসে না, ঘুম পায় তাই জপ কম করে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করছি।'' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ''জপে মন না বসলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাতরপ্রাণে তাঁর নামে প্রীতির জন্য প্রার্থনা জানাতে হয়। একটানা অনেকক্ষণ বসার চেষ্টা না করে বারবার বসে দেখতে হয়।'' সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের অধ্যাত্মজীবন যাতে সুদৃঢ় হয় সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকত। যে-পরমানন্দের সন্ধানে এই সন্ন্যাসজীবন, তার আস্বাদ এই কৌমারবৈরাগ্যবতীরা যাতে পায় তার জন্য তাঁর কত চেষ্টা। বলতেন, ''বারবার মনকে টেনে এনে জপে বসাতে বসাতে দেখবে কোনও সময় হয়তো মন এমন তন্ময় হয়ে গেছে যে আর উঠতেই ইচ্ছা হচ্ছে না।''

তিনি ঠাকুর এবং মায়ের জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতেন এই মঠের সর্বত্র। সেই ভাবটি গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করতেন সকলের মনে। নবাগতাদের বলতেন, ''ঠাকুর বেড়াবেন, হাঁটবেন, চারদিকে ধুলোবালি পড়ে থাকলে তাঁর পায়ে লাগবে—এই

মনে করে পরিষ্কার করবে। দেখবে খুব ভাল লাগবে। একটা ভাব নিয়ে সব কাজকর্ম করবে।" তাঁকে সঙ্ঘে যোগদানের ইচ্ছা জানালে প্রথমেই এই ভাবটি স্পষ্ট করে দিতেন। ''এখানে এলে শুধু ঠাকুরকে ধরে পড়ে থাকা। যেখানে যখন থাকবে জানবে—ঠাকুরের জায়গা।" কোনও নবাগতা সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে জানতে পেরে খুশি হয়ে বলেছিলেন, ''এখন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শুধু এই মনে রাখতে হবে—যা কিছু করছি সব শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ, সব শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ।" কথাপ্রসঙ্গে কখনও বা বলতেন, ''ঠাকুরকে বলবে—ঠাকুর তুমি আমাকে সঙ্ঘে এনেছ, আমি তো নিজের ইচ্ছায় আসিনি, কারণ নিজের ইচ্ছায় কেউ এখানে আসতে পারে না। তুমি যখন এনেছ, তখন দেখো আমি যেন শেষদিন পর্যন্ত এই সঙ্ঘে কুকুরের মতো পড়ে থাকতে পারি।" সঙ্ঘে যোগ দিতে চায় এমন মেয়েদের তিনি কতভাবে সাহায্য করতেন। তাদের জন্য তিনি সবরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাবা-মায়েরা বাধা দিলে কী বলতে হবে তাও শিখিয়ে দিতেন। ঈশ্বরবিশ্বাসের যে-শক্তিতে একদিন তিনি নিজে সমাজ, সংসার, পরিবার, প্রিয়জন সবকিছুকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন সেই একই তেজ তিনি সঞ্চারিত করে দিতেন ত্যাগব্রতীদের মধ্যে।

সঙ্ঘজীবনকে খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছেন বহুদিন ধরে, তাই শ্রীসারদা মঠ শুরুর প্রথম দিন থেকেই এই মঠের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য তাঁর নিজের কাছে যেমন ছিল স্পষ্ট, ঠিক তেমনি অন্যকেও তিনি ওই লক্ষ্যের দিকেই চালিত করতেন। ১৯৫৭ সালের ১৩ মার্চ মঠবাসিনীদের একটি সম্মেলনে তিনি বলেন, ''আমাদের জীবনে ত্যাগ ও প্রেম এই দুইটিকে কার্যকরী করতে পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।... গোলাপ-মা আমাদের বলতেন, 'মনে রাখবে আমি এসেছি নিজের (উন্নতির) জন্য, অপরকে শেখানোর জন্য নয়।' একথা স্মরণ রাখলে মনে আর দ্বন্দ্ব থাকে না।"

এভাবে মঠবাসিনীরা তাঁর জীবন থেকে দিঙ্‌নির্দেশ নিয়ে পথ চলতে শুরু করেছিলেন। তিনিও শাসনে, স্নেহে, আদেশে, উপদেশে তাঁদের সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। জগতের কোনও মালিন্য যেন এসব ফুলের মতন ব্রহ্মচারিণীদের স্পর্শ না করতে পারে সেদিকে ছিল তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি। তিনি নিজে অধ্যক্ষা হলেও সঙ্ঘের আদেশকে নিজের মতামতের ওপরে স্থান দিতেন। তাঁর মাতৃহৃদয় কোনও সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীকে দূরের কেন্দ্রে পাঠাতে ব্যথিত হত, কিন্তু সকলের সমবেত সিদ্ধান্তকেই তিনি মান দিতেন। সুদূর অরুণাচলে যখন নতুন কেন্দ্র খোলা হল, তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সেখানে যাঁরা কর্মী হিসাবে যাবেন তাঁদের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ''ওটা কি মেয়েদের কাজ? ও হল ছেলেদের কাজ!" কিন্তু অছি পরিষদের সিদ্ধান্তই তাঁর কাছে শেষ কথা। তাই এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''মাতৃভবনের কাজও স্বামীজীর কাজ, আর এই খোনসার কাজও স্বামীজীর। সব কিছুই স্বামীজীর কাজ—এই ভাব নিয়ে কাজ করে যাও।" সেজন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি কারও কোনও অনুযোগ যদি তিনি শুনতেন তাহলে এই ভাবটি তার মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করতেন যে সঙ্ঘের আদেশই শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ। সঙ্ঘের উপযোগী লোকব্যবহার শেখাতেন সযত্নে। কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কনিষ্ঠ সন্ন্যাসিনী বা ব্রহ্মচারিণীর ভুল বোঝাবুঝি হলে তিনি অন্যসময় ছোটকে ডেকে সব ব্যাপারটি জানতেন। তারপর ভুল বোঝাবুঝি যে-তরফেরই হোক না কেন ছোটদের বলতেন, ''দেখো, বড়দের সঙ্গে মুখে মুখে কোনও তর্ক করবে না। বড় যদি ভুল বলেন, তবে তখন চুপ করে থেকে পরে তাঁকে বুঝিয়ে

বললে তিনি তোমার কথা বুঝতে পারবেন।”

শ্রীশ্রীমায়ের দীর্ঘদিনের সেবিকা ছিলেন তিনি, তাই তাঁরই মতো উদার মানসিকতা ছিল ভারতীপ্রাণামাতাজীর। যদি সঠিক বলে বুঝতেন তাহলে যেকোনও সিদ্ধান্ত—সে যত বৈপ্লবিকই হোক না কেন—তিনি স্বীকার করে নিতেন। কেরলের ত্রিচুর কেন্দ্রে প্রথম শ্রীশ্রীমাকে মন্দিরের বেদিতে মাঝখানে বসানো হয়েছিল। ভারতীপ্রাণাজী প্রথমবার সেখানে গিয়ে মায়ের এই পরিবর্তিত অবস্থান দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, ‘‘এটা খুব ভাল হয়েছে, শ্রীমা রাজরাজেশ্বরীর মতো মাঝখানে বসে আছেন আর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী তাঁর দুপাশে যেন তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন।” তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, ‘‘হ্যাঁ, আমাদের তো মাকেই কেন্দ্রে রাখতে হবে।” ত্রিচুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ঈশ্বরানন্দজী মাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘‘শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি, শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষাও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিনিধি। সুতরাং তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন।” রামেশ্বর মন্দিরে যেকোনও মঠাধীশ গেলে তাঁকে ‘টেম্পল অনার’ দেওয়া হত। শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষাকেও সেখানকার পুরোহিত একই সম্মান জানালেন। মাতাজী সব সম্মানই আত্মস্থ হয়ে গ্রহণ করতেন। আবার তার খানিকক্ষণ পরেই একটি অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তাঁকে খেতে বসতে হয়েছিল, সেখানেও তিনি সমান নির্বিকার। এই স্থিতপ্রজ্ঞত্ব প্রকাশ পেত তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতি খুঁটিনাটি আচরণে। এ-ব্যাপারে একটি কৌতুকজনক ঘটনা হল, প্রথম সঙ্ঘাধ্যক্ষা হিসেবে তিনি যখন জগদ্ধাত্রীপূজার সময় জয়রামবাটীতে যান, তখন তাঁর পরিচিত জনেদের ছিল অপরিসীম কৌতূহল। যুগলদি মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘‘সরলাদি, তুমি এখন প্রেসিডেন্ট হয়েছ? ভারতমণি তোমার নাম হয়েছে—তোমায় এখন দীক্ষা দিতে হবে!” বিভূতিবাবু বলছেন, ‘‘সরলা, তোমার কাজ হবে দারোয়ানের মতো, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে কারা সব ঢুকছে, কারা বেরোচ্ছে।” ভারতীপ্রাণাজী এসব হাস্যকর বিচিত্র মন্তব্যগুলিকেও নীরবে হজম করে গেছেন, কোনও প্রত্যুত্তর দেননি। যেকোনও পরিবেশে হাজার অসুবিধাকে তিনি শান্তচিত্তে মানিয়ে নিতেন।

সারদা দেবী একসময় প্রার্থনা করে বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিয়ে যাঁরা গৃহত্যাগ করবেন তাঁদের যেন অন্নকষ্ট না হয়। ‘‘ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে।” মায়ের কন্যা তাঁর নামাঙ্কিত মঠে, তাঁরই প্রতিনিধি হিসাবে সেই গুরুদায়িত্ব একনিষ্ঠভাবে পালন করে গেছেন। একবার কলকাতা থেকে জনৈক ভদ্রলোক ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, দীক্ষা দেওয়ার জন্য সারদা মঠে সদ্‌গুরু আছেন কি না। মা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলে দেন, ‘‘বলে দাও—আছেন।” তাঁরই এক শিষ্যা একবার হতাশভাবে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘শ্রীশ্রীমা কি আর আমাকে কৃপা করবেন?” মা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, ‘‘তোমার কী? সদ্‌গুরু পেয়েছ, সদাশ্রয় পেয়েছ!”

গুরুভাবে তিনি সদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে জাগতিক বা আধ্যাত্মিক যেকোনও সমস্যার সমাধানে কখনও দ্বিধা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। তুচ্ছ সংস্কারকে আমল না দিয়ে এমন যুক্তিপূর্ণ সহজ মীমাংসায় তিনি পৌঁছতেন যে সকলে অবাক হয়ে যেত। পাড়া-প্রতিবেশী, ভক্তদের দুঃখকষ্টে, সমস্যায় সহানুভূতির সঙ্গে তিনি পরামর্শ দিয়ে তাঁদের জীবনে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছেন। তিনি পণপ্রথার বিশেষ বিরোধী ছিলেন, মেয়েদের ওপরে কোনও অত্যাচার বা মেয়েদের অপমান

সইতে পারতেন না। এক স্বামী-নির্যাতিতাকে তিনি মঠে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যিনি শেষ জীবন পর্যন্ত মঠে ছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে নারদ বলেছেন, জাগতিক সমস্যার সমাধান জগতেই খুঁজতে যাওয়ার মানে হল, ''যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্/ তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ'' (৪।২৯।৩৩)—ঠিক যেন মাথার বোঝাকে কাঁধে সরানো। স্বামীজী বলছেন, ''পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।'' এ-সংসারের দুঃখজ্বালাকে নিবৃত্ত করতে আমরা সংসারের দিকেই হাত বাড়াই, কিন্তু দুঃখ কমে না। জগতে এত অতৃপ্তি দেখেই তো বুদ্ধদেব বলেছিলেন, ''সর্বমেব দুঃখম্' আর সেই যন্ত্রণার প্রতিষেধক খুঁজতে জগৎ ত্যাগ করেছিলেন। এ-পৃথিবীতে যতরকম সমস্যা আছে সবকিছুর প্রকৃত সমাধান হয় অধ্যাত্মপথে। শ্রীশ্রীমার প্রার্থনায় সেজন্য ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের একটি সুস্পষ্ট ছবি আঁকা ছিল যেখানে সাধুরা ভগবানকে অবলম্বন করে জীবন কাটাবেন এবং সংসারে যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের কাছ থেকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার যথার্থ পথের সমাধান পাবেন, যে-পথ হল অধ্যাত্মপথ। শ্রীসারদা মঠের প্রথম সঙ্ঘগুরু এই ব্রতটি সারা জীবন সুচারুভাবে সম্পন্ন করে গেছেন। একবার এক ভক্তমহিলা কিছু উপদেশ চাওয়াতে মাতাজী বলেছিলেন, ''মঠে যখন আসবে, যাতে মনে অহংকার না আসে সেরকম সাধারণ পোশাক পরে আসবে। তোমরা সংসারে আছ, মঠে এসে আর সংসারের কথা আলাপ করবে না।... সংসারের কাজ বেশি করতে হলে রাগ করবে না। রাগ করে কাজ করলে নিজের ক্ষতি হয়। শ্রীশ্রীমার চিন্তা করবে। এখানে তো তোমরা সৎ শিক্ষা আর উপদেশ শোনার জন্যই আস। মঠের সঙ্গে এই যোগাযোগ সর্বদা রাখবে আর সবসময় শ্রীশ্রীমার স্মরণ-মনন করবে। মার উপদেশ যখন যেমন তখন তেমন—সেভাবে থাকার অভ্যাস করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মদিনে মঠে অবশ্যই আসবে।''

তাঁর দীক্ষিতা এক প্রবাসী কন্যার প্রথম গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। পরের বার সন্তানসম্ভবা হলে আত্মীয়রা তার কল্যাণের জন্য বিশেষ একটি যজ্ঞ করার অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন। মা উত্তরে লেখেন, ''আমি যজ্ঞ করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ও (মেয়েটি) শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম পেয়েছে। সেই নাম জপ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে তাঁর কৃপাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'' বাস্তবিকই তার আর কোনও বিপদ হয়নি।

শ্রীশ্রীমায়ের মতনই ভারতীপ্রাণামাতাজী ছিলেন একাধারে গুরু এবং জননী। যাদের দায়িত্ব তিনি নিতেন তাদের সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যার কথাগুলিও মন দিয়ে শুনতেন। এমনকী স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হচ্ছে না, বিচ্ছেদে অনুমতি চাই—সেসব সমস্যাও তিনি সহানুভূতির সঙ্গে শুনতেন, প্রয়োজনীয় বিধান দিতেন। তাঁর এক গৃহী সন্তান বড় দুর্ভাবনা নিয়ে মঠে গেছেন। দুঃস্বপ্ন দেখে রাতে তাঁর ঘুম হয় না। মা বললেন, ''এতদিন আমায় বলনি কেন? যাক চিন্তা কোরো না, ঠিক হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমার মুখের কথা, 'আমার সন্তানদের কারও কোনও ক্ষতি হতে পারে না।' তুমি কি খুব গরম জিনিস খাও? রোজ মাথায় তেল দিয়ে স্নান করবে, বিকেলে যেন কোরো না। আর এক চাকা মিছরি জলে ভিজিয়ে তাতে একটু লেবুর রস নিংড়ে সকাল-সন্ধে খাবে, মুসাম্বির রসও খাবে। তারপর আমি তোমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মাল্য দেব, সেটি একটি কাপড়ের থলিতে ভরে বালিশের নিচে রেখে দেবে।''

মনে পড়ে, একবার পূজনীয়া শ্রুতিপ্রাণামাতাজী বলেছিলেন, ''আমি তো সঙ্ঘের সঙ্গে এক হয়ে গেছি।'' ভারতীপ্রাণামাতাজীর এই একাত্মতা এত

গভীর ছিল যে সঙ্ঘের প্রতিটি সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণী যেন তাঁর নিজেরই অঙ্গ। মঠের প্রতিটি অঙ্গের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম, পক্ষপাতহীন ভালবাসা ছিল। তিনি তাঁদের হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারতেন। তাঁকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, ''মা, অনেক দূরে কী হচ্ছে না হচ্ছে আপনি জানতে পারেন?'' মাতাজী উত্তর দেন, ''আমি যদি বসে মন একাগ্র করি তবেই জানতে পারি। আমাদের সন্ন্যাসিনীরা দূরে তীর্থাদিতে গেলে যদি চিঠিতে খবরাখবর না পাই, বসে মন একাগ্র করলে তাদের দেখতে পাই, তারা কেমন আছে, কী ঘটছে জানতে পারি।'' তাঁর কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং সঙ্ঘ ছিল অভিন্ন এবং সেই সঙ্ঘের সঙ্গে তিনিও ছিলেন অভিন্ন।

১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। ১৯৭২ সালে দুর্গাপূজা শেষে বিজয়ায় প্রণাম করতে একাদশী তিথিতে তিনি বেলুড় মঠে যান। মন্দিরে দর্শন-প্রণামাদি শেষ করে তিনি অধ্যক্ষ মহারাজের ঘরে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ তাঁর শরীরের কথা চিন্তা করে প্রণাম করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি প্রণাম করে উত্তর দিলেন, ''আবার কবে আসি?'' বেলুড় মঠে তাঁর আর যাওয়া হয়নি। সঙ্ঘাধ্যক্ষের প্রতি নিজের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রসঙ্গে তিনি একসময় বলেছিলেন, ''রাজা মহারাজ আর প্রভু মহারাজ কি মানুষ হিসাবে এক? তা নয়, কিন্তু তাঁরা দুজনেই এক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিনিধি।''

বেলুড় মঠের এক প্রাচীন মহারাজ বলেছেন, দুর্গাপ্রতিমা প্রতিবছর পালটে যায়, কিন্তু সেই এক মা দুর্গাই বছর বছর পূজা গ্রহণ করেন। ঠিক তেমনই সঙ্ঘাধ্যক্ষের পুণ্য শরীর শ্রীরামকৃষ্ণপ্রতিমা। নির্ধারিত সময়ে তার বিসর্জন হয়, আবার নতুন প্রতিমা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের দায়িত্ব নেন। ''সঙ্ঘগুরুর অন্তরে বসি করিতেছ তুমি জীব উদ্ধার।'' শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা হলেন জগজ্জননীর সচল বিগ্রহ। জগন্মাতা শ্রীসারদার প্রথম প্রতিমাটি প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী। তাঁর অসামান্য জীবন আমাদের বিস্মিত করে, প্রণত করে। আমাদের প্রার্থনা, তাঁর মহাজীবন আমাদের 'সঙ্ঘশরণ তীর্থযাত্রা'পথটিকে আলোকিত করে রাখুক বহুকাল, চিরকাল।

বিজ্ঞপ্তি

প্রতিটি সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে পৃথকভাবে নিতে হলে এক বছরের নবীকরণের টাকার সঙ্গে (১৩০+১২০) ২৫০ টাকা এবং তিন বছরের হলে (৩৮০+৩৬০) ৭৪০ টাকা পাঠাতে হবে।

বছরে তিনবার দুটি করে সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে হলে এক বছরের জন্য (১৩০+১০০) ২৩০ টাকা এবং তিন বছরের জন্য (৩৮০+৩০০) ৬৮০ টাকা পাঠাতে হবে।

এইভাবে যাঁরা নেবেন তাঁদের আর পূজাসংখ্যার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রি চার্জ দিতে হবে না।

শুধুমাত্র পূজাসংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়ার জন্য ৪০ (চল্লিশ) টাকা পাঠাতে হবে।